ফোকাস রাইটিং ২০২২

জুলাই সংখ্যা

সূচীপত্র

০১. ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতি
০২. আশ্রয়ণ প্রকল্প
০৩. পদ্মাসেতু দেশের অর্থনীতি ও পর্যটনশিল্পে খুললো সম্ভাবনার দুয়ার
০৪. সার্বজনীন পেনশন একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ
০৫. সাইবার হামলা মোকাবিলায় আরও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
০৬. মেধা পাচার : উন্নয়নের পথে অন্তরায়
০৭. Bangabandhu Tunnel transmuting Chittagong into ‘One City Two Town’
০৮. KGF Addressing the Effects of Climate Change on Agriculture Bangladesh, a deltaic country
০৯. Padma Bridge: The Door of Immense Potential Opens for Country's Economic and Tourism Sector
১০. Intellectual trafficking: Bar to development

উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি আর্টিকেল চাকরিপ্রার্থীদের ফ্রি সার্ভিস দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পত্রিকা হতে বাছাই করা হয়েছে।

দরিদ্রতম দেশের তকমা থেকে বিশ্বের৪১তম বৃহৎ অর্থনীতি

এক সময়ে বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আজ বিশ্বের বিশ্বয় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে বিশ্বয়কর উত্থান ও অগ্রযাত্রা এখন সারাবিশ্বে স্বীকৃত। আর এসবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগের ফলে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ খাত দশ প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। রূপকল্প-২১ সামনে রেখে এসব প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক রচিত হবে। একই সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর হওয়ার স্বপ্নপূরণ হবে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়তা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে নেয়া এই দশ কর্মসূচিকে ব্র্যান্ডিং করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে দারিদ্র্যমোচনে দক্ষতা অর্জনে আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে নেয়া একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পকে এগিয়ে নেয়া এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিয়োগ বিকাশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন।

এছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিনিয়োগ বিকাশ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের ফলে দেশে বিনিয়োগের খরা কাটবে বলেও সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। ‘বিনিয়োগ বিকাশ’ বহির্বিশ্বে এমনভাবে ব্র্যান্ডিং করা হবে যাতে বিদেশিরা এদেশে বিনিয়োগ এগিয়ে আসেন। এছাড়া দেশি উদ্যোক্তাদেরও আস্থা ফিরিয়ে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

এদিকে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ইতোমধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিনিয়োগের প্রধান বাধাগুলো কী, তা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসব বাধা দূর করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো চেষ্টা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতিও বিনিয়োগবান্ধব করা হয়েছে। এছাড়া ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে ওই দেশগুলোর জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষণ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
ইতোমধ্যে সরকার ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। শুধু তা-ই নয়, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে আগামী ১৫ বছরে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর ফলে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের।

প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে এই দশ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। এই কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন ও ব্র্যান্ডিং-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সমন্বয় করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বিগত বছরগুলোয় বিভিন্ন খাতে যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো উদ্যোগই প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা-প্রসূত, যা ইতোমধ্যে ‘শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে এবং হচ্ছে।

দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর এবং এসডিজি অর্জনে এসব খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) মূল ভাবনার সঙ্গে সরকারের সার্বজনীন মানব উন্নয়ন চিন্তার ব্যাপক মিল রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ভাবনা কার্যকরভাবে উপস্থাপন করে সব কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন স্তরের নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

চলমান মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু, মেট্রোরেল, পায়রা সমুদ্রবন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং এলএনজি টার্মিনাল ইত্যাদি।

পদ্মা বহুমুখী সেতু: বর্তমান সরকারের চ্যালেঞ্জ বহুল প্রত্যাশিত এ প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর গত ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেতুটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করেছেন। পদ্মা সেতু রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সরাসরি সংযোগ সৃষ্টি করছে। এর ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৯ ভাগ বা ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার ২১ জেলার ৩ কোটিরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে এ সেতুর মাধ্যমে।

পদ্মা রেলসেতু সংযোগ: দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্প ২০২২ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সরকারের। ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেলপথ নির্মাণের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-খুলনা পথে ২১২, ঢাকা-যশোর পথে ১৮৪ এবং ঢাকা-দর্শনা পথে দূরত্ব কমবে ৪৪ কিলোমিটার। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৫৮.৫ শতাংশের বেশি। (মে/২২ পর্যন্ত)

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার গুনদুম রেলপথ: পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত প্রকল্পটির ব্যয় ১৮ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা। দোহাজারী রামু কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্প কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৭১ শতাংশের বেশি। আগামী ২৩ সালের জুনে জনসাধারণের জন্য করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজধানী ঢাকা থেকে সরাসরি ট্রেনে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কক্সবাজার যাওয়া যাবে।

বঙ্গবন্ধু (কর্ণফুলী) টানেল: আগামী ডিসেম্বরে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৮৬ শতাংশের বেশি।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হবে। তবে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও রেলগেট পর্যন্ত আগামী ডিসেম্বরে উন্মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৭৮.৮৯ শতাংশ।

মেট্রোরেল: মেগা প্রকল্পগুলোর অন্যতম এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা আছে ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা। সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্পে ৫ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা ও জাপান ১৬ হাজার ৫৯৮ কোটি টাকা জোগান দেবে। ২০২৪ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। সার্বিক কাজের অগ্রগতি শতকরা ৭৫ শতাংশের বেশি। তবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের কাজের অগ্রগতি ৯২ শতাংশের বেশি। উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আগামী ডিসেম্বরে করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পায়রা সমুদ্রবন্দর: দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের অনগ্রসরতা, আমদানি বৃদ্ধি এবং বন্দরের ভবিষ্যৎ ধারণক্ষমতা বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। দেশের তৃতীয় এ বন্দর নির্মাণে ২০১৩ সালের নভেম্বরে জাতীয় সংসদে ‘পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন’ নামের একটি আইন পাস হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১ হাজার ১৪৪ কোটি টাকার ২০২৩ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৬৫ শতাংশের বেশি।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র: বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পাবনার ঈশ্বরদীতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাশিয়া প্রকল্প ব্যয়ের ৯০ শতাংশ ঋণ হিসেবে বাংলাদেশকে দিচ্ছে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জোগান দেবে বাংলাদেশ। ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এ প্রকল্প থেকে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫০ শতাংশ। প্রথম ইউনিটের কাজের অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। এ ইউনিট হতে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় গ্রিডে পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র: কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নে ৬০০ মেগাওয়াট করে দুটি কেন্দ্রের মধ্যে মোট ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প নেয়া। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে জাপান দেবে ২৮ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা। পাওয়ার প্লান্টের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭৬.৯০ শতাংশ। প্রথম ইউনিট জানুয়ারি ২০২৪ এবং দ্বিতীয় ইউনিট জুলাই ২০২৪ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে। কাজের অগ্রগতি ৫১ শতাংশের বেশি।

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র: ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বাগেরহাটের রামপালে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৪ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি ইউনিটের মাধ্যমে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এই প্রকল্পে।

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর: দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপে। বন্দরটি হলে তা প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য ব্যবহার করতে পারবে। সরকার মনে করে, বন্দরটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এলএনজি টার্মিনাল: সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র শেষ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাস সংকট বিরাজ করছে। এ সংকট নিরসনে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির লক্ষ্যে মহেশখালী উপকূলে দৈনিক ৫০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। টার্মিনাল থেকে মূল ভূখন্ডে গ্যাস আনতে ৯১ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ টার্মিনালের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয় ১৯ আগস্ট ২০১৮ থেকে। ৩০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ৪১৪,২৯৭.৪৭ এমএমএস সিএফ।

কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দর্শনটি আজ বাংলাদেশের অগ্রগতির অভিযাত্রায় অন্তর্ভুক্তমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল হিসেবে সমাদৃত, যা আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারাকে নবপল্লবে বিকশিত করে একটি ক্ষুধা- দারিদ্র্য মুক্ত আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথকে সুগম করেছে। সকল সমস্যা মোকাবিলা করে ২০৩০ সালে এসডিজি এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠন করাই এখন সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ।

জাহিদুল ইসলাম ফারুক

আশ্রয়ণ প্রকল্প: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে দেশ। এই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে দরিদ্রতা। জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। একটানা ৩ মেয়াদে সরকার পরিচালনা করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে গত সাড়ে ১২ বছরে তিনি এ হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হতে হলে দারিদ্র্যের হার আরও কমাতে হবে। দেশের অসহায়-দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে হবে।

‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন-গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা ঘোষণা দিয়েছেন- “বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।” প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের তালিকা করা হয়। এই তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি চলমান প্রক্রিয়া। তালিকা অনুযায়ী ‘ক শ্রেণি’ অর্থাৎ একেবারেই ভূমিহীন ও গৃহহীন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৬১ জনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া যার জমি আছে কিন্তু ঘর নেই অথবা জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর ঘর রয়েছে এমন ‘খ শ্রেণি’ ভুক্ত ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারের তালিকা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৬০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত সকল পরিবার পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসিত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় পরিবারগুলোকে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করেন। কক্সবাজার ও অন্যন্য উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৯৭ সালের ১৯ মে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন পরিদর্শন করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন ও ছিন্নমূল গরীব পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে বছরই দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্প চালু করেন।

আশ্রয়ণ মানে কেবল আবাসনের ব্যবস্থা নয়; বরং এটির পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। উপকারভোগীরা দুই শতাংশ করে জমি পেয়েছেন; একটি অর্ধপাকা দুই কক্ষের ঘর পাচ্ছেন; বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগছে এখানে এবং এতে রয়েছে গোসলখানা, টয়লেট ও রান্নাঘর। গৃহসহ জমি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে দলিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো হচ্ছে। প্রতি দশটি পরিবারের সুপেয় পানির জন্য থাকছে একটি করে নলকূপ। ফলে ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন সুবিধাভোগীগণ। তাদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্মিত হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। আশ্রয়ণের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের শরীর গঠন ও বিনোদনের জন্য প্রকল্প এলাকায় রয়েছে খেলার মাঠ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক গ্রামের সকল নাগরিক সুবিধাই থাকছে আশ্রয়ণ প্রকল্পে।

উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পেশামুখী দশ দিনের প্রশিক্ষণ। বিশেষ করে ব্যারাকে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মৎস্য চাষ, পাটি বুনন, নার্সারি, নকশীকাঁথা, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক ওয়ারিং এবং রিক্সা-সাইকেল-ভ্যান গাড়ি মেরামতের মতো ৩২টি পেশায় প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ চলাকালে তাঁদের আয়-রোজগারের যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য প্রতিদিন ৭৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে উপকারভোগীগণ সমবায় সমিতি গঠন করে আয়-বর্ধনকারী ব্যবসা বা পেশা চালুর জন্য ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাচ্ছেন। ব্যারাকে পুনর্বাসিত পরিবার প্রতি প্রাথমিকভাবে ৩ মাসের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন, বয়স্ক, বিধবা, বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন তারা। অর্থাৎ একজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদে পরিণত করে আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, “খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদির ওপর জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বা অধিকার প্রতিষ্ঠাতে অসামর্থ্য হওয়ার কারণেই অর্থাৎ ফেইলিওর অব এন্টাইটেলমেন্ট বা স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কারণে সমাজে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যদশা দেখা দেয়।” প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কর্মসূচিতে। বিশ্বে এটি প্রথম এবং সর্ববৃহৎ উদ্যোগ যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক উপকরণ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং সবার জন্য বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। পরিবেশ ও জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় প্রধামন্ত্রীর অঙ্গীকার পূর্ণতা পেয়েছে। আশ্রয়ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর ১নং দারিদ্র্যের অবসান, ২নং ক্ষুধা নির্মূল, ৩নং স্বাস্থ্যসেবা, ৪নং মানসম্মত শিক্ষা, ৫নং লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ৬নং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন, ৮নং উপযুক্ত কর্মসংস্থান, ১০নং অসমতা কমিয়ে আনা এবং ১১নং টেকসই ও নিরাপদ জনবসতি এর মতো অনেকগুলো লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য আসছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারণার প্রচলন ছিল। বৈদেশিক সাহায্য, খাদ্য সহায়তা, ত্রাণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণের নামে শোষণ ও বঞ্চনার কারণে একজন দরিদ্র ব্যক্তি চরম দারিদ্র্যদশার মধ্যে পতিত হতেন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক ড্যানি রড্রিক পূর্ব এশিয়ার উচ্চ প্রবৃদ্ধির ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, এখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমির মালিকানা পুনর্বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে কাজ করে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীরা ঘরসহ ভূমির মালিকানা পাওয়ার পাশাপাশি আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও পরিবার হীনমন্যতা কাটিয়ে একটি সম্মানজনক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার স্বপ্ন দেখছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারা মেধা ও শ্রম দিচ্ছে। এভাবেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সামিল করছেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাংলাদেশের দরিদ্রতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের এই নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে ‘শেখ হাসিনা মডেল’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ‘শেখ হাসিনা মডেল’ এর মূল ৬টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:
১. উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা
২. সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৩. নারীদের ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন
৫. ব্যাপক হারে বনায়ন ও বৃক্ষ রোপন করে পরিবেশের উন্নতি সাধন এবং
৬. গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতির মূল দর্শনই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা সে লক্ষ্য পূরণে দিন-রাত কাজ করে চলেছেন। “বাদ যাবে না একটি মানুষও”- এ মূলনীতিকে সামনে রেখেই তিনি সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলাদেশ’ এর দিকে ক্রমশ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আশা করা যায়- উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

এম এম ইমরুল কায়েস

পদ্মাসেতু দেশের অর্থনীতি ও পর্যটনশিল্পে খুললো সম্ভাবনার দুয়ার

সব আলোচনা, সমালোচনা আর জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গত ২৫ জুন উদ্বোধন হলো আমাদের স্বপ্নের সেতু। পদ্মাসেতু দেশের জন্য কি পরিমাণ সুফল বয়ে এনেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশে পর্যটন সম্ভাবনার নতুন এক দরজা উন্মোচন হলো পদ্মাসেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। খরস্রোতা নদীর থই থই জলরাশির মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ধূসর রঙের দ্বিতল কাঠামোর এই জাতীয় স্থাপনার প্রতি মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। স্বপ্নের সেতুকে ঘিরে মানুষের তাই অন্যরকম অনুভূতি ও উচ্ছ্বাস। বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের পদ্মাসেতু বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন পূরণের অনন্য এক নিদর্শন তো বটেই সঙ্গে ওই অঞ্চলের মানুষের রুটি-রুজির নতুন এক সম্ভাবনাও।

পদ্মাসেতুর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর জেলার জাজিরাসহ দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে। আর এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে অনন্য অবদান রাখবে। পদ্মাসেতু দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত স্বপ্নের পদ্মাসেতু এখন বাস্তব। ঢাকার সাথে মোংলা বন্দর, বরিশাল, কুয়াকাটা, পায়রা বন্দর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক খাতে এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। পদ্মাসেতুর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। দেশের অর্থনীতিতে পদ্মাসেতুর ভূমিকা নিয়ে এর আগে বিশ্বব্যাংক বলেছিল, পদ্মাসেতু বাস্তবায়িত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এক দশমিক দুই শতাংশ বেড়ে যাবে। আর প্রতি বছর দারিদ্র্য নিরসন হবে শূন্য দশমিক ৮৪ ভাগ।

পদ্মাসেতু দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পদ্মাসেতুর দুই পাড় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক পদ্মার দুই পাড়ে নান্দনিক সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘুরতে যায়। মাওয়া ও শরীয়তপুর প্রান্তে রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, হোটেল-মোটেলসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পদ্মাসেতুর ল্যান্ডিং পয়েন্ট জাজিরায় তাঁতপল্লী প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান ও খ্যাতনামা দেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান এসব এলাকায় বিনিয়োগ করছে যা উক্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

পদ্মাসেতু চালুর মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা দেখছেন এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা বলছেন, দেশের পর্যটনের মানচিত্র পাল্টে দেবে পদ্মাসেতু। এর ফলে দ্রুততম সময়ে যাওয়া যাবে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ও সাগরকন্যা কুয়াকাটায়। লঞ্চে পটুয়াখালী হয়ে কুয়াকাটা পৌঁছাতে সময় লাগে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা। তবে পদ্মাসেতু দিয়ে গেলে অর্ধেক সময়েই পৌঁছানো যাবে। গত বছরের অক্টোবরে পটুয়াখালীর লেবুখালী সেতুর উদ্বোধন হওয়ায় এ যাতায়াত আরো সহজ হবে। বিশ্বঐতিহ্য সুন্দরবন, ষাটগম্বুজ মসজিদসহ বাগেরহাট ঘিরে পর্যটনশিল্পে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখছেন তারা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার ও বন বিভাগকে সমন্বিত ও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা নিলে এর গতি আরো ত্বরান্বিত হবে।

এতদিন মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাট নদী পার হতে আসা মানুষের ভিড়ে ঠাসা ছিল। পদ্মাসেতু চালু হওয়ায় এখন সেই ঘাট রূপ নেবে নিস্তব্ধতায়। তবে এ ঘাট রাতে পরিণত হয় নাগরিক ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার কেন্দ্র হিসেবে। পদ্মাসেতু ঘিরে পর্যটকের পদভারে আবারো মুখর হবে আশপাশের এলাকা। এ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের দৃষ্টিনন্দন স্থানগুলোতে বাড়বে পর্যটক। এতে প্রাণ পাবে এ বিস্তীর্ণ এলাকার পর্যটন। শিমুলিয়া ঘাটের হোটেল ব্যবসায়ী নুর হোসেন বলেন, ঘাটের পালা শেষ হলেও নদীর ধারে বেড়াতে আর ইলিশ খেতে আসা মানুষের আনাগোনায় পর্যটন জমবে পদ্মাসেতুর পথে। এখন তারা সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন। আদি পেশা বদল করে মাওয়া-জাজিরার অনেকেই এখন পর্যটনকেন্দ্রিক নতুন ব্যবসায় ঝুঁকছেন। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের পর্যটনের উদ্যোক্তারাও নতুন সেবা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

পদ্মাসেতু চালুর ফলে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কুয়াকাটায়, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরার উপকূলজুড়ে অবস্থিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনকেন্দ্রিক পর্যটনও নতুন রূপে জেগে উঠবে। পাশাপাশি শ্বাসমূলীয় বনাঞ্চল বরগুনার তালতলী উপজেলার টেংরাগিরি, শুভসন্ধ্যা সৈকত, পাথরঘাটার হরিণঘাটা বন, সমুদ্রসৈকত, বরিশালের দুর্গাসাগর দিঘি, সাতলার শাপলাবিল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠির ভাসমান পেয়ারা বাজার, ভোলার চর কুকরী মুকরী, মনপুরা হতে পারে পর্যটকদের নতুন গন্তব্য।

পদ্মাসেতু চালুর আগেই দুই পাড়ের সংযোগ সড়কের উভয় পাশেই শুরু হয়েছে পর্যটকদের জন্য নানা বিনোদনের আয়োজন। স্থানে স্থানে চা-কফির দোকান, খাবার হোটেল, বিশ্রামাগার, সুদৃশ্য যাত্রী ছাউনিও নির্মাণ করা হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গার চার রাস্তা মোড়ে গোল চত্বরের পাশে নির্মাণ করা হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় কয়েকটি স্পট। বরিশালের দপদপিয়া, বিমানবন্দর, গড়িয়ার পাড়, শিকারপুর এলাকায় মহাসড়কের দুপাশে বেসরকারি খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন চলছে একের পর এক। আর এসবই হচ্ছে পদ্মাসেতুকে টার্গেট করে। জাজিরার নাওডোবা থেকে শিবচরের মাদবরচর পর্যন্ত পদ্মাসেতুর জন্য নির্মিত সাড়ে ১০ কিলোমিটার নদীশাসন এলাকা এখন দৃষ্টিনন্দন বিনোদনকেন্দ্র। খুব কাছ থেকে সেতু দেখার জন্য সেখানে প্রতিদিন শত শত মানুষ ভিড় করছেন।

পর্যটন উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নিরাপত্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। পদ্মাসেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। এই সেতু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমানে ভ্রমণপ্রেমীদের অন্যতম আকর্ষণ পদ্মাসেতু। দেশের পর্যটনের গতিধারাও বদলে দিতে পারে এই সেতু। ইতিমধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোও পদ্মাসেতুকে ঘিরে বিভিন্ন রকম ভ্রমণ প্যাকেজের পরিকল্পনা করছেন।

রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ে পণ্য পরিবহন করে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি গতিশীল হবে এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত (যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকন করা যায়), ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে মালদ্বীপের ন্যায় পর্যটন আকর্ষণ তৈরি করা সম্ভব এবং সুন্দরবন ঘিরে ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম উন্নয়নের অনন্য সুযোগ রয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন চরগুলোকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মালদ্বীপের ন্যায় পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা গেলে প্রচুর পরিমাণ আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণ করা সম্ভব। ঢাকা থেকে কক্সবাজার যেতে যে সময় লাগে পদ্মাসেতু দিয়ে গেলে তার চেয়ে অর্ধেক সময়ে পর্যটকেরা কুয়াকাটা ও সুন্দরবন পৌঁছে যাবে।

পায়রা বন্দরের সাথে বুলেট ট্রেন চালু করার কথা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে কুয়াকাটাসহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে যা দেশি ও বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিবছর পর্যটকবাহী ৪৫টি ক্রুজ ভারতে কুচবিহার-চেন্নাই-গোয়া হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে চলে যায়। তবে এই ক্রুজগুলো যদি পায়রা বন্দরে আকৃষ্ট করা যায় তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। পদ্মাসেতু গতিশীল করবে মংলা ও পায়রা বন্দরকে যা সুনীল অর্থনীতিতে অনন্য অবদান রাখবে।

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল যেমন কুয়াকাটা, মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর কেন্দ্র করে সমুদ্র পর্যটনের সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। নদীভিত্তিক ও সমুদ্রভিত্তিক পর্যটনে সময়োপযোগী সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তৈরি করবে কর্মসংস্থান সুযোগ, শক্তিশালী হবে জাতীয় অর্থনীতি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণের জন্য পদ্মাসেতুর ও দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলো ছোট ছোট প্রমো তৈরি করে ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন।

পদ্মাসেতু আমাদের বড় অর্জন। যেখানে পুরো বিশ্ব বলেছিল বাংলাদেশ পদ্মাসেতু নির্মাণ করতে পারবে না, সেখানে খরস্রোতা পদ্মার বুকে বাংলাদেশ নিজেদের অর্থায়নে পদ্মাসেতু করে দেখিয়েছে। এটা বাঙালি জাতির সাহস ও সামর্থ্যের বড় দৃষ্টান্ত। পদ্মাসেতু এখন মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এই পদ্মাসেতু ঘিরে এখন তৈরি হয়েছে অপার সম্ভাবনা। পদ্মাসেতু হওয়াতে আশপাশের অঞ্চলসমূহে এখন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরি হবে। যা পূর্বে ছিল অকল্পনীয়। আর এতে দেশের অর্থনীতিতে খুলবে নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজা। সমৃদ্ধ হবে দেশ, দেশের অর্থনীতি। পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে দূষণের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। তাই পদ্মা যেন দূষণমুক্ত থাকে সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া পদ্মাসেতু উদ্বোধনের পর থেকে বিভিন্ন অনভিপ্রেত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। এসব অনভিপ্রেত ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পদ্মাসেতু সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। পদ্মাসেতু আমাদের গর্বের জায়গা। এ সেতু নির্মাণে আমাদের অনেক বাধা, অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। সব বাধা পেরিয়ে, সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অবশেষে আমরা সফল হয়েছি। এ সেতু আমার, আপনার, আমাদের সবার। আর এ সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও এর মর্যাদা রক্ষা আমাদের সবার দায়িত্ব।

ইমরান ইমন : কলাম লেখক।

সার্বজনীন পেনশন একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ

সরকার সম্প্রতি সর্বজনীন পেনশন সুবিধা চালু করতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে নাগরিকগণের সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিজনিত কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনয়ন করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার হ্রাসজনিত কারণে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে। তাই সর্বজনীন পেনশন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই আইন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ নামে অভিহিত। ব্যক্তি পেনশন হিসাব অর্থ হচ্ছে, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার শর্তাবলি অননুসরণে চুক্তি অনুযায়ী চালু একজন চাঁদাদাতার হিসাব। দুস্থ চাঁদাদাতা হচ্ছেন পেনশন স্কীমে চাঁদা প্রদানকারি কোনো চাঁদাদাতা, যিনি শারীরিক বা মানসিক কারণে অসমর্থ হয়ে চাঁদা প্রদানের সক্ষমতা হারিয়েছেন। এই আইন কার্যকরের পর সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করবে।
সেই কর্তৃপক্ষ এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করবে যেমন, সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতির আওতায় এর চাঁদাদাতা গণের স্বার্থ সংরক্ষণ; সর্বজনীন পেনশন স্কিম গ্রহণ, স্কিমে প্রবেশ যোগ্যতা, শর্তসমূহ নির্ধারণ, অনুমোদন, স্কিম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং পেনশন তহবিলের পুঞ্জিভূত জমার বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা।

পেনশন স্কীমে চাঁদাদাতা গণের জমাকৃত অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ; চাঁদাদাতাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতিকার প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন; কর্তৃপক্ষ স্বয়ং অথবা অপর কোনো কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন বা এ বিষয়ে কোন গবেষণার নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহ বা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; জনসাধারণের মধ্যে সর্বজনীন পেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, অবসরকালীন নিরাপত্তা ও পেনশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও বহুল প্রচারের মাধ্যমে পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

সর্বজনীন পেনশন স্কীমের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফি বা অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ, নির্ধারিত স্থান এবং সময়ে, হিসাব সংরক্ষণ বই ও অন্যান্য দালিলিক কাগজপত্র প্রকাশ এবং সর্বজনীন পেনশন বা পেনশন তহবিল বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোন অভিযোগ বা বিরোধ নিষ্পত্তির বা অনিয়ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিজ নামে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিম বা এই স্কিমের আওতাধীন কোন কার্যক্রম, স্কিম অথবা প্রকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা কর্মচারী এই আইনের কোনো ধারা অথবা এর অধীনে প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে আদালতের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা কর্মচারীর এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাব ক্রোক করতে পারবে। গভর্নিং বোর্ড, প্রয়োজনে যেকোনো ব্যক্তিকে গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। গভর্নিং বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন প্রবিধান প্রণয়নসহ কর্তৃপক্ষের যেকোনো নীতি বা কৌশল অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করবে। গভর্নিং বোর্ড পেনশন তহবিলের অর্থ সরকারি সিকিউরিটি, কম ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য সিকিউরিটিজ, লাভজনক অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত গাইডলাইন অনুমোদন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হবে, যথা: (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, (খ) এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য ফি ও চার্জ (গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; (ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ এবং (ঙ) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। তহবিলের অর্থ কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হতে অর্থ উঠানো যাবে।

সরকার অবিলম্বে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট সম্বলিত বা শর্তে বা পদ্ধতিতে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করবে যথা, (ক) জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স হতে ৫০ বৎসর বয়সী সকল বাংলাদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে (খ) বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীগণ এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে (গ) অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাক না কেন, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারী না হওয়া পর্যন্ত সরকারি ও আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত-কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতা বহির্ভুত থাকবে। (ঘ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপনজারী না করা পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি স্বেচ্ছাধীন থাকবে (ঙ) সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির পর একজন চাঁদাদাতা ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং চাঁদাদাতার বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন তহবিলে পুঞ্জিভূত মুনাফাসহ জমার বিপরীতে পেনশন প্রদান করা হবে (চ) প্রতিটি চাঁদাদাতার জন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র পেনশন হিসাব থাকবে, যা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি পরিচালিত হবে। (ছ) চাকরিরত চাঁদাদাতাগণ চাকরি পরিবর্তন করলেও পূর্ববর্তী হিসাব নতুন কর্মস্থলের বিপরীতে স্থানান্তরিত হবে, নতুনভাবে হিসাব খোলার প্রয়োজন হবে না (জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাসিক সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারিত হবে। মাসিক এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চাঁদা প্রদান করতে পারবে এবং অগ্রীম ও কিস্তিতে জমা প্রদানের সুযোগ থাকবে (ঝ) মাসিক চাঁদা প্রদানে বিলম্ব হলে, বিলম্ব ফি

সহ বকেয়া চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে পেনশন হিসাব সচল রাখা যাবে এবং উক্ত বিলম্ব ফি চাঁদাদাতার নিজ হিসাবে জমা হবে। (ঞ) পেনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন (ট) পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কালের অর্থ্যাৎ মূল পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন (ঠ) কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বে চাঁদাদাতা মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তাঁর নমিনিকে ফেরত দেওয়া হবে। (ড) পেনশন তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন পর্যায়ে এককালীন উত্তোলনের প্রয়োজন হলে, চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমাকৃত অর্থের সর্ব্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যাবে, যা ধার্যকৃত ফিসহ পরিশোধ করতে হবে এবং ফিসহ পরিশোধিত অর্থ চাঁদাদাতার নিজ হিসাবেই জমা হবে (ঢ) পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে কর রেয়াতের জন্য বিবেচিত হবে এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। (ণ) সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতিতে সরকারি অথবা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অংশ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং (ত) সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রজ্ঞাপন জারী হওয়া সাপেক্ষে, নিম্ন আয়সীমার নিচের নাগরিকগণের অথবা দুস্থ চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করতে পারবে।

কর্তৃপক্ষ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা পরিচালনা, পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা, চাঁদাদাতার চাঁদা জমাকরণ, পেনশনের অর্থ প্রদান, ইত্যাদি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সম্মুখ অফিস প্রতিষ্ঠা বা পেনশন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অথবা নিয়োগ ও পরিচালনা করতে পারবে। এই আইনের আওতায় চাঁদাদাতার সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানই হবে পেনশনের সম্মুখ অফিস। তফসিলি ব্যাংক এবং ডাক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ এবং বিধিদ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পেনশনের সম্মুখ অফিস হিসেবে কাজ করবে।

সর্বজনীন পেনশন তহবিলে চাঁদাদাতার চাঁদা জমা, জমার হিসাব সংরক্ষণ, পুঞ্জিভূত অর্থের সুষ্ঠু ও নিরাপদ বিনিয়োগ এবং পেনশন প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এই আইনের আওতায় পেনশন কার্যক্রমে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য বিধিদ্বারা নির্ধারিত কেন্দ্রীয় রেকর্ড কিপিং ব্যবস্থা থাকবে। চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত পেনশন তহবিল বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের বিষয়টি বিধিদ্বারা নির্ধারিত হবে।

বিধিদ্বারা নির্ধারিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংক জাতীয় পেনশন তহবিলের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করবে। চাঁদাদাতা পেনশন বয়সে উপনীত হলে এই আইনের আওতায় বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ অ্যান্যুইটি সার্ভিস প্রদান করবে। কর্তৃপক্ষ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়ায় মাসিক পেনশন পেনশনারের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পৌছানো নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীভূত ও স্বয়ংক্রিয় পেনশন বিতরণ পরিকাঠামো গঠন করা হবে।

মো. আরাফাত রহমান
লেখক: সহকারি কর্মকর্তা, ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

সাইবার হামলা মোকাবিলায় আরও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

বাংলাদেশে এখনও বিভিন্ন ব্যাংক সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকাকে বড় ঝুঁকি হিসেবে দেখছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। সাইবার হামলার ঝুঁকি প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এটা মোকাবিলায় আমাদের যে প্রস্তুতি তাতে অনেক ঘাটতি আছে। এটা উত্তরণের চেষ্টা না করলে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেসব গোষ্ঠী সাইবার হামলা চালায়, তারা যেসব জায়গায় সাইবার অবকাঠামো দুর্বল সেগুলোকে বেছে নেয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এটা চেক করে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়মিত সাইবার অডিট করাতে হবে। আর সবসময় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সজাগ থাকতে হবে। দেশের অর্ধেক ব্যাংকই সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে বলে ২০১৯ সালে এক গবেষণায় জানিয়েছিল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট। দেশের ব্যাংকে আইটি বিষয়ে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এ জন্য টেকনোলজি উন্নতি করতে হবে। শুধু ভালো সফটওয়্যার কিনলেই হবে না। এগুলো যথাযথ পরিচালনার জন্য দক্ষকর্মীও তৈরির পরামর্শ দিয়েছে বিআইবিএম।

ব্যাংকিং খাতে দফায় দফায় সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে। ফলে আইটি সিকিউরিটিতে বরাদ্দ বেশি রাখছে ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে আইসিটির ব্যবহার শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালের পর থেকে তবে ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে আইসিটির ব্যবহার বাড়তে শুরু করে, সেই অবস্থা থেকে আইসিটি এখন ব্যাংক খাতের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড এক মুহূর্তের জন্য পরিচালনার কথা ভাবা প্রায় অসম্ভব। ডিজিটাল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উজ্জ্বল প্রকাশ আমাদের ব্যাংকিং খাত। এখানে যাবতীয় লেনদেন হিসাব-নিকাশ, অর্থ স্থানান্তরসহ সব কাজই এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে।

মাত্র কিছু সময়ের জন্য যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটে, তাহলে একটি ব্যাংকের চরম বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংকের যে ক্ষতি হয়, সেটা কোনো না কোনোভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

কিন্তু একটি ব্যাংকের অনলাইনভিত্তিক কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে সেই ব্যাংকের পক্ষে একদিনও টিকে থাকা সম্ভব নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে দেশে প্রথাগত ব্যাংকিং মাধ্যমের লেনদেনকে ছাড়িয়ে গেছে অনলাইনভিত্তিক লেনদেন। এর ফলে ব্যাংক খাতের সামগ্রিক কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, অন্যদিকে এই খাতের মুনাফা বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নির্ভুল লেনদেনের মাধ্যমে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বাড়াতেও আইসিটির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গত দেড় দশকে ব্যাংকের কর্মীদের কর্মদক্ষতা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। আইসিটিতে বিনিয়োগ ব্যাংক খাতের জন্য অবশ্যই লাভজনক। ব্যাংকের আইসিটি খাতে এক টাকা খরচ করলে তা কতটা মুনাফা নিয়ে আসে তা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইসিটিতে ১ টাকা বিনিয়োগ করলে ব্যাংকের জন্য তা ১৩৬ টাকার সমান উৎপাদনশীলতা তৈরি করে। এর বিপরীতে প্রযুক্তিবহির্ভূত খাতে ১ টাকা খরচ করলে সেটি ৫৮ টাকার সমপরিমাণ উৎপাদনশীলতা নিয়ে আসে। একইভাবে আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান আছে, এমন একজন কর্মীর পেছনে এক টাকা খরচ করা হলে ব্যাংকের আয় বাড়ে ২৫ টাকার সমান। সাধারণ একজন কর্মীর পেছনে এক টাকা খরচ করলে ব্যাংকের আয় বাড়ে ৬ টাকা।

অর্থাৎ আইসিটিতে দক্ষ একজন কর্মীর পেছনে ব্যাংকের বিনিয়োগ চারগুণ বেশি লাভজনক। অর্থাৎ লেনদেন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে একজন কর্মীর আর্থিক লেনদেনের দক্ষতাও এ সময়ে প্রায় চারগুণ বেশি বেড়েছে। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকের মুনাফাও বেড়ে গেছে, একথা আজ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং প্রভৃতির দ্রুত বিকাশ এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা খুব সহজেই চোখে পড়ে।

এখন বেশিরভাগ গ্রাহক অনলাইন ব্যাংকিং-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন বাস্তব প্রয়োজনেই। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে ব্যাংকের জটিল লাভ-ক্ষতির হিসাবকরণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ এবং নির্ভুল হয়েছে। আগে যা করতে প্রচুর সময় লাগত, বিলম্বিত হতো ব্যাংকের সঠিক মুনাফা প্রক্রিয়াকরণ কাজ। এখন তা নির্বিঘ্নে করা সম্ভব হচ্ছে।

এখন ব্যাংকের লেনদেনে ভুলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বাড়লেও এ ক্ষেত্রে আইটি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাংকগুলো এখনও যথেষ্ট বিনিয়োগ করছে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, আইটি কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা না করলে তা ব্যাংকের জন্য সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। ব্যাংক খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, যার কারণে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে দারুণ গতির সঞ্চার হয়েছে। সেই আইসিটিকে ব্যাংক খাতের প্রধান একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ভিন্ন।

এখনও আইসিটিকে ব্যাংক খাতের মূল ব্যবসা থেকে আলাদা করে দেখার একটি মানসিকতা বহাল রয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নতুন গতি সঞ্চারকারী আইসিটি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলিত অবস্থায় রেখে দিলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। এ খাতের নীতি নির্ধারকদের পুরোনো মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, বাস্তবতার নিরিখে আইসিটি খাতকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি সিরিয়াসলি নিতে হবে।

২০০০ সালেও আইসিটিতে ব্যাংকের বিনিয়োগ বলতে বোঝাতো সফটওয়্যার ও কিছু কম্পিউটার কেনা। সেই অবস্থা থেকে আইসিটির কারণে ব্যাংক খাতে নতুন অনেক সেবা এসেছে, কর্মদক্ষতাও বেড়েছে। তারপরও ব্যাংকের আইটি বিভাগের কাজকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে।

আইটি বিভাগে যারা কাজ করছেন তাদেরও মানসিকতা আইটি বিভাগেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তারা এর বাইরে ব্যাংকের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিতে ইচ্ছে প্রকাশ করছেন না। আইটি খাতের লোকজনদের ব্যাংকের মূল ব্যবসা বোঝারও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, প্রযুক্তি ব্যবহার করে রিটেইল ব্যাংকিংয়ে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাংকের সেবা নিয়ে যেতে প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই- এটা সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

দেশের অধিকাংশ ব্যাংক নিজেদের সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিত নয়। ব্যাংক খাতের সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে অর্ধেকেরও বেশি ব্যাংক কর্মীর সচেতনতার অভাব রয়েছে। ব্যাংকিং খাতে সাইবার ঝুঁকি বাড়ছে।

ব্যাংকিং খাতের তথ্য নিরাপত্তা বাধায় আরও কিছু কারণ রয়েছে। এগুলো হলো, নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জানা-শোনার অভাব, গ্রাহকদের অসচেতনতা, ব্যাংকগুলোর বাইরের আইটি প্রতিষ্ঠানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, ব্যাংকিং খাতে দক্ষ আইটি কর্মীর অভাব, যথেষ্ট পরিমাণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা এবং আইটি খাতে বাজেটের স্বল্পতা। এসব থাকার কারণে ব্যাংকিং খাতে সাইবার ঝুঁকি বাড়ছে। দেশের ব্যাংকগুলো এখনও বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন অনুযায়ী নিরাপত্তা মানে পৌঁছাতে পারেনি। এ কারণে ব্যাংকিং খাত এখনও ঝুঁকিমুক্ত হতে পারেনি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিনিয়ত সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটছে এবং সেগুলো খুব বড় ধরনের যা জটিলও বটে। এটা আর্থিক খাতের পুরো সিস্টেমকে নষ্ট করে ফেলছে। আজকাল এই অপরাধীরা সাইবার আক্রমণ করে বড় অংকের তহবিল হাতিয়ে নিচ্ছে এবং এটিএম জালিয়াতির মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বিশ্বব্যাপী যেভাবে সাইবার হামলা হচ্ছে, তাতে যে কোনো সময় বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। বিশেষ করে, বিমানবন্দর, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যবসায়িক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সব প্রতিষ্ঠানই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দেশের সব ব্যাংকের অনলাইন তথ্যভান্ডার বা ডাটা সেন্টার ঢাকায় অবস্থিত। একইভাবে বিকল্প ডাটা সেন্টারগুলো ঢাকায় অবস্থিত। এটি ব্যাংকের সাইবার নিরাপত্তার জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করা যায়। কারণ, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগকালে বিপর্যয়ে তথ্য উদ্ধারের সম্ভাবনা অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকে যে পদ্ধতিতে আইটি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, সেটিও নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এখানেও অনেক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাংক খাতের সাইবার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক অভিভাবকসুলভ ভূমিকা রাখতে পারে। আইটি বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে বিনিময়ে একটি সম্মিলিত তথ্যভান্ডার তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই তথ্য ভা-ারে সব ব্যাংকের জন্য আইটি নিরীক্ষা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন হালনাগাদ তথ্য থাকবে।

বর্তমানে ১০০ শতাংশ ব্যাংকের কার্যক্রম অনলাইননির্ভর হওয়া সত্ত্বেও আইটিতে কিছু কিছু ব্যাংক প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। এই সমস্যা সমাধানে ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটি অংশ আইটি খাতে অবশ্যই বিনিয়োগ করা উচিত। দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহার না করে ব্যাংকগুলো অহেতুক বিদেশি সফ্টওয়্যারের দিকে ঝুঁকছে। ব্যাংকের টাকায় অহেতুক বিদেশ ভ্রমণ কিংবা অন্য কোনো লাভের আশায় কিছু ব্যাংক কর্মকর্তা এ কাজ করছেন। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সাইবার ঝুঁকিতে অবহেলা করার সুযোগ নেই কোনোভাবেই। এ ধরনের একটি বড় ঝুঁকি ব্যাংকিং খাতে থাকলেও ব্যাংকিং খাতে দক্ষ আইটি কর্মীর অভাব রয়েছে। আইটিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে উন্নতমানের কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘন ঘন সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনে আরও যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে।

আইটি নিরাপত্তা জোরদারে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে আইটি নিরাপত্তা বিষয়ে আরও জোর দিতে হবে। কোনো রকম আগাম সংকেত পেলেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টেকসই অর্থনীতির জন্য আমাদের ব্যাংকগুলোকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে আরও গভীরভাবে মনোযোগী এবং উদ্যোগী হতে হবে।

রেজাউল করিম খোকন, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা ও কলাম লেখক

মেধা পাচার : উন্নয়নের পথে অন্তরায়

মেধা পাচার একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা, যা মানুষের অভিবাসন প্রক্রিয়ার একটি অনুষঙ্গ। কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কিংবা শিক্ষিত মেধাবীদের বিরাট অংশের অভিবাসন অথবা অন্য দেশে গমনের ফলে মেধা পাচার ঘটে। সাধারণত যুদ্ধ, সুযোগ-সুবিধার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা জীবনযাপনের ঝুঁকি এড়াতে মেধা পাচার ঘটে থাকে। মেধা পাচারের কারণে একটি দেশ তার সবচেয়ে মেধাবী, জ্ঞানী, দক্ষ ও যোগ্য নাগরিককে হারায়।

ইদানীং বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পেয়ে একসময় হতাশ হয়ে বিদেশে পাড়ি জমান। বৃত্তিসহ লোভনীয় সব সুবিধার কারণে তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। সিংহভাগ শিক্ষার্থীর গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি শিল্পোন্নত দেশ। এসব দেশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও লোভনীয় অন্যান্য সুবিধা দিয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের বড় অংশই পড়াশোনা শেষ করে আর দেশে ফেরে না। এর মধ্যে অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও রয়েছেন। অভিবাসী হওয়া দেশগুলোতে চাকরি, বসবাসের সুযোগ ও জীবনযাত্রার উচ্চমানের কারণে তারা দেশে ফেরেন না বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। তবে দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে এ দেশের মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এ যুগে যখন বিশ্বের অনেক দেশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রণোদনা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছে, তখন আমাদের দেশ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারছে না। সৃজনশীল গবেষণা খাতে নেই উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ। ফলে উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকলেও উদ্ভাবনের সুযোগ পাচ্ছেন না এ দেশের অসংখ্য উদ্ভাবনশীল বিজ্ঞানীরা। যার ফলে ঘটছে অনিবার্য মেধা পাচার।

আসলে একটি দেশের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে মানসম্মত অবদান রাখার সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা যখন নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে সে দেশের স্বার্থে স্থায়ীভাবে কাজ করেন বা মেধাকে কাজে লাগান তখন এ বিষয়টিকেই মেধা পাচার বলে। এসব ব্যক্তি হলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, বিজ্ঞানী ইত্যাদি। এমনকি যার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তার ক্ষেত্রেও মেধা পাচার বিষয়টি প্রযোজ্য। প্রতি বছর আমাদের দেশের একটি বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে যান। কিন্তু তারা আর দেশে ফেরত আসেন না বা আসতে চান না। তাদের শিক্ষা খরচের বাবদ দেশের একটা বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করা হয়। এ কারণে ইদানীং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মেধা পাচার একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এটি সম্ভাব্যভাবে একটি জাতির সমগ্র উন্নয়নকে স্থবির করে দিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও মেধা পাচারের ঘটনা প্রতি বছরই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মেধা পাচার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনেসকোর ‘গ্লোবাল ফ্লো অব টারশিয়ারি লেভেল স্টুডেন্টস’-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। দুঃখের বিষয় এই যে, তাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই আর ফিরে আসেন না। এভাবে মেধা পাচার হতে থাকলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে যাবে অথচ সরকার এই মেধাবী শিক্ষার্থীদের পেছনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। এক তথ্যে জানা যায়, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় করে ৫ লাখ টাকা, একজন বুয়েটের শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় করে ১০ লাখ টাকা আর একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় করে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। তাদের পেছনে এই অর্থ ব্যয় হচ্ছে জনগণের কষ্টার্জিত ঘামের টাকায়। অথচ মেধা পাচারের সুফল ভোগ করছে উন্নত বিশ্ব। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অনুন্নত বিশ্ব থেকে ১০ লাখ মেধাবী, দক্ষ, কারিগরি ও পেশাদার ব্যক্তি গ্রহণ করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে, বাংলাদেশে একটি জরিপ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ দেশের ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ বিদেশে পাড়ি জমাতে পছন্দ করে। এই সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে দেশের একটি বিরাট অংশ ধরেই নেন যে তাদের মেধা, সৃষ্টিশীলতা ও যোগ্যতার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন এ দেশে সম্ভব নয়। তাই তারা নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দেওয়াটা বেছে নেয়, যেন তাদের মেধার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। সম্ভাবনাময় এই প্রজন্মকে হারিয়ে স্বদেশের উন্নয়নের যাত্রায় ধাক্কা, অগ্রগতিতে ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

২০২১ সালের ওপেন ডোর রিপোর্ট অন ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জের এক তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্র ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ৮ হাজার ৫৯৮ জন বাংলাদেশিকে স্টাডি পারমিট দিয়েছে এবং এটি ২০০৯ সালের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি। এফএসিডি-ক্যাব বলছে, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বৃত্তি পাওয়া বাংলাদেশির সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। ইউনেসকোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে প্রায় ২৪ হাজার ১১২ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমায় এবং ২০২০ সালে এ সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হিসাবে প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার জন্য ৭০ হাজার থেকে ৯০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমান।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রতি ব্যাচের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীই বিদেশে চলে যান। তাদের খুব কিয়দাংশই দেশে ফিরে আসে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বুয়েটের ১১৮ জন শিক্ষক বিদেশে গেলেও ফিরেছেন মাত্র ৩৮ জন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক তথ্য বলছে, ২০২০ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩ জন শিক্ষক অবৈধভাবে দেশের বাইরে ছিলেন। তারা ছয় বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছেন ঠিকই অথচ তারা বিনা বেতনে বিদেশে থাকার অনুমতি চেয়ে আবেদনও করেননি। তবে ২০২০ সালে ১০৩ জন শিক্ষক বিনা বেতনে বিদেশে ছিলেন। ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি ছাড়া বিদেশে থাকায় ৫২ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় একই অভিযোগে ১৯৭২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮০ জন শিক্ষককে অব্যাহতি দিয়েছে। তবে এসব অভিবাসী দেশে প্রচুর রেমিট্যান্স পাঠালেও অনেকে একে ‘ব্রেইন ড্রেন’ বা মেধা পাচার বলে অভিহিত করেন। তারা রেমিট্যান্সে পর্যাপ্ত অবদান

রাখলেও তাদের শূন্যতার কারণে দেশে উন্নয়ন ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয় এবং তাদের অভাব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করলে দেশ ও জাতি নানাভাবে উপকৃত হতে পারে।

মেধা পাচারের কারণগুলো খুঁজতে গেলে দেখা যায়, মেধা পাচারের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকেই একটি সুস্থ ও উন্নত জীবনযাপনের আশায় বিদেশে পাড়ি জমান, তবে আমাদের শিক্ষার্থীরা যে প্রত্যেকেই এই আশায় দেশ ছাড়ে তা বলা যায় না। আমরা অনেক সময়ই তাদের কটাক্ষ করে বলে থাকি, তারা স্বার্থপর ও দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। দেশের টাকা খরচ করে তারা বিদেশে সুখের জীবনযাপন করছে; কিন্তু তা পুরোপুরি সঠিক নয়। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষার্থীই হতাশ হয়ে দেশ ছাড়েন। একটা অসুস্থ সিস্টেমের জন্য অনেকেই দেশ ছাড়েন। অনেকেই বারবার চাকরির চেষ্টা করে যখন মেধা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পান না তখন বাধ্য হয়ে তাদের দেশ থেকে দূরে বসবাস করতে হয়। আবার আমাদের দেশে জব সেক্টরগুলোর ভিন্নতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক অনেক বিভাগ খুললেও আমরা কাজের বৈচিত্র্যতা আনতে পারিনি। তাই কাজের সুযোগ না পেয়েও অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমান। স্বাধীনতার এত বছর পর বিজ্ঞানের তেমন কোনো উন্নতি ছাড়াই আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বের হওয়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিদেশগামী হচ্ছেন বেশি করে। কারণ তাদের যে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ দরকার, তা দেশে নেই বললেই চলে। আবার বিপরীত দিকে, যারা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরত আসতে চান, তারা আসার পর নানা রকম জটিলতার সম্মুখীন হন। অনেকেই দেশে ফিরে এলেও তারা আর কর্মক্ষেত্রে তেমন সুযোগ পান না। কারণ, যে সেক্টরে তারা পড়াশোনা করেছেন তা দেশে অপ্রতুল। তাই তারা আবার বিদেশে ফেরত যান। আমাদের দেশে চাকরি পেতে হলে তোষামোদকারী হতে হয়, যেটা অনেকেরই পছন্দ নন। সেজন্য তারা দেশ ছেড়ে অন্য দেশের স্থায়ী নাগরিক হন।

সত্যিকারভাবে মেধা পাচার বন্ধে প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ। দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে মেধাবীদের দেশে যথাযথ মূল্যায়নে এখনই সচেতন হতে হবে। এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। বৃদ্ধি করতে হবে গবেষণা খাতে বরাদ্দ। বিজ্ঞানীদের বেতনসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা ও সৃজনশীলতাকে সম্মান ও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি দেশের মেধাকে দেশেই কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যেন তাদের মেধার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং দেশের অগ্রযাত্রায় তারা ভূমিকা রাখতে পারেন। একটি মেধাহীন জাতিতে পরিণত হওয়ার আগেই উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

Bangabandhu Tunnel transmuting Chittagong into ‘One City Two Town’

The country's maiden tunnel 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel' has been constructed under the Karnafuli River to accomplish the port city of Chittagong a 'One City Two Town' model in the vogue of Shanghai, China. The tunnel will assemble the two edges of the city by opening in December this year. Well-known Chittagong will substitute if this tunnel is unfastened. River-hill and sea-estuary Chittagong will get a neoteric look. Another Chittagong will be augmented on the other side of the river. Housing system including trade and commerce will be expanded.

Like Shanghai in China, Chittagong will be a one city two town. The Karnafuli River divides the commercial capital of the country, Chittagong. Although three bridges have already been built over this river, it is not adequate for this salient region. In addition, the construction of a bridge over the Karnafuli River generated a difficulty of siltation at the bottom, which posed a major threat to the port of Chittagong. Although Chittagong metropolis is economically advanced due to the country's major seaports, Anwara on the other side of Karnafuli endures dilapidated. The port was not swelled across the Karnafuli river due to lack of road congruence.

To address this complication, the government took initiative to build a tunnel at the bottom without constructing any new bridge at Karnafuli. The embryonic 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel' on the Karnafuli River in Chittagong while accomplished, it will be the first tunnel under the river in South Asia. The length of this path at the bottom of the river is 3.32 km. All the lane you will be under a masses of water. Now it takes an hour to cross the path only five minutes to tunnel. The tunnel can be reached from the tourist city of Cox's Bazar and Matarbari deep seaport.

If it is effectuated, it will revolutionize the road communication system in the region. The tunnel will connect the salvation of the country's economy with the Dhaka-Chittagong highway and the Chittagong-Cox's Bazar highway. Due to the tunnel, a bridge will be initiated between the commercial capital of the country and the port city of South Chittagong. Urbanization, industrialization and port activities will be lengthened on the south bank of Karnafuli river. Vast economic endeavor is going on in South Chittagong including the economic zone around the tunnel project. The Korean Export Processing Zone in Anwara, Chittagong the largest private sector fertilizer factory (Kafco), Chittagong Urea Fertilizer Factory Limited (CUFL) and Chittagong Port are expanding their operations. Besides, a number of industries including coal based thermal power plant and LNG station are being set up at Matarbari in Maheshkhali upazila of Cox's Bazar with domestic and foreign investment. The 'One City Two Town' is being built in Chittagong following the Shanghai City of China, mainly around the Karnafuli Tunnel which is going to open the gateway to new economic possibilities. As a result, the way of living for the people of this region will swap.

The construction of the Karnafuli Tunnel will initiate massive employment and surge exports due to industrial development, headway of tourism industry and easy communication system around the arena. Thus, massive socio-economic advancement of the country including poverty alleviation will be consummated. According to the DPP, if the project is implemented, the financial and economic IRR will be 8.19 percent and 12.49 percent respectively. In addition, the Financial and Economic Benefit Cost Ratio (BCR) will be 1.05 and 1.5 gradully. As a result, construction of Karnafuli tunnel will have a great impact on GDP.

Consequently, the construction of Karnafuli Tunnel modern communication system will be developed between Dhaka-Chittagong and Cox's Bazar and connection will be established with Asian Highway. Therefore travel time and cost will be reduced and the process of transporting raw materials and manufactured goods from the eastern part of the country to Chittagong port, airport and northwestern part of the country will be convenient. The construction of the Karnafuli Tunnel Project will have a significant impact on the economic headway of the country, including the elimination of unemployment, subsequently the simplification and modernization of industries as well.

The tunnel project will ensure a direct road link network with the mega project fleet around Matarbari, the Chittagong Port Bay Terminal and the Bangabandhu Industrial City accomplished over a large area of Mirsarai and Sonagazi in Feni. Besides, the country's first deep seaport is being built in the Matarbari area of Maheshkhali in Cox's Bazar. Banshkhali is a coal based thermal power plant. There is an LNG station in Maheshkhali and Anwara is a large economic zone. Bangabandhu Tunnel will play a revolutionary role in communicating with these mega projects. If it is launched, there will be huge decisive innovations in the development, investment, industrialization, and tourism and housing sectors in the greater Chittagong region including the port city.

This tunnel will make a significant contribution to the national economy. The writer is former president of Bangladesh Journalism Students Council (BJSC)Road Accident — a Menace to Development According to the dictionary definition, an accident is an unforeseen, unimaginable and accidental event. But when certain events happen again and again for the same reason, the reasons that are connected to the system or structure, they are no longer accidental or unforeseen; so they are no longer common accidents, and become the result of managerial or structural negligence. Accidents in which innumerable people are regularly injured or killed on roads and highways of Bangladesh every day can no longer be termed as accidents.

These are accidents caused by mismanagement or negligence. Death due to negligence can also be considered as death with negligence. Road accidents are not stopping in any way. Despite taking various steps, road accidents are not decreasing in the country. It seems that now it has turned into an incurable disease. Almost every day, one accident after another is happening on the roads of the country including the capital. It has become now a long procession of death.

Many people are losing their lives prematurely and the injured are living a miserable life. There is no guarantee that anyone will be able to return his or her home after going out of their home. It is shocking to see the statistics of the increasing number of road accidents in the country. According to the report of the Bangladesh Road Safety Foundation, there were 427 road accidents in the country in April 2022. 543 people were killed and 612 injured in these accidents. Among the dead were 67 women and 81 children. A total of 206 people were killed in 189 motorcycle accidents, accounting for 37.93 per cent of the total deaths. 116 pedestrians were killed in the accident, which is 21.36 per cent of the total deaths. The driver and assistant of the vehicle were killed by 87 people, i.e. 16 per cent. On average eighteen people were killed in road accidents every day in April. A total of 431 people between the ages of 18 and 65 were killed in the accident or 79.37 per cent. Another report of the same organization published in the media in 2022 revealed that 6,284 people were killed and 7,468 injured in 5,371 accidents across the country in 2021.

Among the dead were 803 students of different educational institutions. As a result, 13 per cent of those killed in road accidents last year were students. According to media reports published at different times, 15,000 small and big road accidents happen in Bangladesh every year. According to the Bangladesh Road Transport Authority (BRTA), about 30 people die in road accidents across the country every day. According to its estimate, the number of deaths per year stands at 10,800. According to the World Bank, 12,000 people die every year and according to the World Health Organization, 25,000 people die in road accidents every year. A report released by the World Bank titled 'Delivering Road Safety in Bangladesh: Leadership Priorities and Initiatives to 2030' stated that the death rate in Bangladesh has largely reached the highest in South Asia. In Bangladesh, 102 people die in every 10,000 vehicles involved in accidents.

According to the Bangladesh Road Safety Foundation, there has been a sharp rise in accidents involving high-speed vehicles, including trucks, and motorcycles. Mentally and physically ill drivers are recklessly driving freight vehicles and reckless motor cyclists of minors and young people are getting themselves into accidents and attacking other vehicles. Pedestrian casualties have also risen sharply. Just as pedestrians do not follow the rules on the road, so do vehicles. As a result, the number of pedestrian deaths is increasing. “In this alarming context, no effective government initiative is visible in controlling road accidents. There is no interest among the concerned authorities in the implementation of 'The Road Transport Act-2018'. Road accidents are happening mainly due to anarchy and mismanagement in the road transport sector. To improve this situation, it is necessary to formulate and implement sustainable road transport strategies. The political will of the government is needed for this" said the president of Bangladesh Road Safety Foundation.

The Road Safety Foundation has made several recommendations to prevent road accidents such as increasing initiative to create skilled drivers; the driver's salary and working hours must be specified; the capacity of BRTA needs to be enhanced; ensuring uninterrupted application of traffic laws to transport owners, workers, passengers and pedestrians; separate side roads (service roads) should be created for these by stopping the movement of low-speed vehicles on the highways; road dividers should be constructed on all highways in phases; extortion on public transport must stop; railways and waterways need to be rehabilitated and expanded to reduce road congestion; formulate and implement sustainable transportation strategies; Road Transport Act-2018 should be implemented without any hindrance. On the other hand, a meeting of the Dhaka Ahsania Mission's Road Safety Project recommended that five behavioral changes in road traffic could help reduce accidents. According to them, if the speed of vehicles is reduced by an average of five per cent, then it is possible to reduce accidents by 30 per cent.

If the law prohibiting the driving taking of alcohol can be implemented 100 per cent, then the number of deaths in accidents can be reduced by 20 per cent. Using a standard helmet can reduce the risk of accidental death by 40 per cent and the risk of head injury by 70 per cent. Similarly, wearing a seatbelt reduces the risk of death between the driver and the passenger in the front seat by 45-50 per cent and the risk of death and serious injury among the passengers in the rear seat by 25 per cent. Safe seats for children are similarly effective in reducing the risk of fatalities and deaths in road accidents, especially for 70 per cent of child passengers, especially older children, and 54-80 per cent for older children. Increasing the awareness of pedestrians or road users in road use will also reduce road accidents to a great extent. It is said that improved transport and road communication system is essential for the development of the socio-economic condition of a country. It is a prerequisite for socio-economic progress. That is, economic development and improved transport and communication systems are inextricably linked. Also, the improved transportation system carries the identity of civilization. Bangladesh has already become a developing country and is moving forward to become a developed country by 2041. So it is an urgent need to stop road accidents and improve the road and transportation system. Due to death and injuries caused by road accidents smiles on the faces of thousands of people are getting gloomy every year. Because, regardless of the statistics and financial loss, do we measure the pain of the parents, siblings, relatives or any family member of a person who dies in a road accident? Can we pay the price of grief of a mother over the death of a child?

It is not possible to pay the price in any way. Therefore, it is important to consider this issue seriously and take appropriate steps in this regard. Although many successes have been achieved in the country's road communication and transport system, more initiatives need to be taken to prevent road accidents. Regular pedestrians and drivers need to be made aware to prevent road accidents.

Besides, regular mobile courts have to be conducted. Anyone who drives an unfit vehicle without a driving license will have exemplary punishment. It seems that the time has come to pay special attention to the prevent road accidents and saving the lives of people in our country. It is expected that the authorities will take effective steps in this regard with the help of experts in this sector. The writer is a researcher and development worker

KGF Addressing the Effects of Climate Change on Agriculture Bangladesh, a deltaic country

Having a large population in a small area, faces frequent natural disasters, according to IPCC, in terms of risks of natural disasters, it is the 7th most vulnerable country in the world. As a consequence of global warming, natural disasters like floods, cyclones, tidal surges, droughts, etc have been battering the country for quite some time now. These natural hazards are causing huge losses in agricultural sectors and thus impacting lives and livelihoods of people along with infrastructural damages. What should be the way forward, what are the adaptation and mitigation options to cope with climate change impacts? The 2015 Paris Climate Agreement on carbon emission reductions has not been taken seriously by most of the developed countries and, thus, the global temperature is on a steady rise inducing frequent natural calamities. The poor and the developing countries continue to be the hardest hit. The average global temperature in 2006 was 14.50OCwhich increased steadily to 14.70OC in 2018. In Bangladesh, the average annual temperature has increased by 0.64% in 2018 which is 10.2 times higher than the annual average temperature increase rate (0.06%) in 1971. This increase in temperature impacted agricultural production negatively. In order to overcome these adversities, innovative research to develop appropriate climate-smart technologies are essential to maintain productivity sustainably. Krishi Gobeshona Foundation (KGF), a non-profit organization committed to agricultural research and development (R&D) in Bangladesh. KGF has been financially sponsoring and technically promoting R&D on climate change related issues in agriculture since 2010.KGF established the Network for Climate Change in Agriculture (NCCA)platform in 2010 with the goal of implementing and managing a research and development project in collaboration with the National Agricultural Research System (NARS), agricultural universities, and Bangladesh Meteorological Department.

Initially, under the leadership ofDr. Nurul Alam, Executive Director and supervision of Dr. Abdul Hamid, Director (P&E), KGF, organized training programs on relevant subjects for about 120 professionals from different institutes followed by specialized training on DSSAT, DNDC, InfoCrop, AquaCrop modeling, GIS and remote sensing, R Program, etc.for assessing, forecasting and predicting the effects of temperature, water availability and nutrient management on the growth and yield of crops under changing climate. Recently, R&D work on livestock, fisheries and socioeconomicswas initiated and is on-going to assess the impact of climate change on their life cycles and productivity. The initiative of KGF was helpful to form a team of trained professionals from Bangladesh Rice Research Institute(BRRI), Bangladesh Agricultural Research Institute(BARI) and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University (BSMRAU)for formulating and execution of acoordinated project "Modelling Climate Change Impact on Agriculture and Developing Mitigation and Adaptation Strategies for Sustaining Agricultural Production in Bangladesh. "This project, in its first phase of 2015-2018, helped to build the capacity of agricultural scientists of the country to assess, evaluate and quantify the impacts of various climatic elements on soil, water and selected crops along with insect pests and disease incidences.

About 40 scientists worked for the project and successfully completed its first phase in 2018. In the meantime, the project scientists have been able to effectively use different types of models for assessing the effects of rising temperature and Carbon dioxide levels on the growth and development of rice, wheat, mungbean, mustard etc., and have shared their findings in about 30 scientific articles published in reputed national and international journals. A book was also published in 2020 for delineating adaptation and mitigation strategies against climate change impacts on Bangladesh agriculture. A project proposal was submitted for KGF funding for studying climate change impact on crops, livestock, fisheries and socioeconomics which was deeply appraised by the current Executive Director of KGF, Dr. Jiban Krishna Biswas and by Dr. Sheikh Mohammad Bokhtiar, Executive Chairman, BARC and Chairman ofKGF Board who approved second phase of the project. The second phase of the project for three years began in November 2020with the involvement of BARI, BRRI, BAU and BSMRAU. The progresses made so far are remarkable which have been through the publication of 10 scientific articles in internationally renowned journals.

The project activities resulted in some tangible outputs- (i) increased rainfall in March, May, June, July, August, September and October during 2021-2040 and 2041-2060, (ii) increased incidences of drought in Rajshahiregion, (iii) possibility of 5-30% reduction in transplanted aman rice yield if temperature rises by 1-3oC, (iv) about 2-23% reduction of Boro rice yield depending on temperature rises and varieties used, (v) increased soil mineralization resulting in loss of soil organic matter, etc. Besides, rise in temperature influences growth of flora and fauna, adversely affected milk and meat quality. Similarly, fisheries scientists have found that differences in water quality and temperature affect the growth and reproductive capacity of tilapia. Emissions of Green House Gas(GHG) and sequestration of carbon varied greatly depending on crops grown and management practices. Carbonemission from crop fields, for example from irrigated paddy field, could be 660 kg CO2 eq./ha depending on life cycle-based assessment. This emission can be minimized following alternate wetting and drying (AWD) method. On the other hand, introduction of upland crop like wheat and maize in rice-rice cropping system results carbon sequestration. For example, about 2109 kg CO2/ha took place during wheat cultivation indicating that emissions from crop sector might not be a critical issue, but we have to find out total scenarios. However, evidence of large-scale GHG emissions from livestock rearing houses have been found.

Therefore, integrated research on GHG emissions needs to be intensified and strengthened. The agriculture sector contributes about 13.5% of the GDP- still an important driver of socioeconomic development. Unfortunately, this vital sector is the worst hit by global warming impacts. We have to develop management options to cope with increased natural hazards for sustained food and nutrition security. The development and dissemination of extreme temperature stress tolerant varieties with high yield potentials might play an important role in future agriculture. There is no substitute to develop and use of appropriate models for understanding the effect of climate change on crop-livestock-fish production, types of infectious disease outbreaks in future. Research on cutting-edge technologies need to be continued, but funding from KGFis inadequate and thus looking into the prospect of receiving fund from international donor agencies would be a commendable endeavor.A policy decision can be taken to allocate funds from the Climate Change Trust Fund through the Ministry of Agriculture.

Dr Shahrina Akhtar, Dr Shahrina Akhtar is a Technical Specialist of Krishi Gobeshona Foundation.

RESHEP'S
CAREER CARE

Padma Bridge: The Door of Immense Potential Opens for Country's Economic and Tourism Sector

Putting an end to all discussions, criticisms and speculations, our dream's bridge--the Padma Bridge was finally inaugurated on June 25. The extent to which the Padma Bridge has brought benefits to the country cannot be overstated. One of the new doors of tourism sector in the country was opened with the inauguration of the Padma Bridge. There is no end to the interest of people in this kind of gray two-story structure that stands in the middle of the rushing waters of the rapid river. People have different feelings and excitement around the dream's bridge. The much-awaited Padma Bridge is a unique example of fulfilling the dream of the people of the southern part of Bengal, as well as a new possibility of earning a living for the people of that regions. The Padma Bridge connects the Louhajang upazila of Munshiganj with the Jajira of Shariatpur district and the northeast with other districts in the south and south-west. And it will make a vast contribution to social, economic and industrial development. The Padma Bridge has connected 21 districts in the south and south-west of the country.

The Padma Bridge, a long-awaited dream of the people of this region, is now a reality. Along with Dhaka, a new door will be opened in the economic sector of Mongla Port, Barisal, Kuakata, Payra Port, Khulna, Gopalganj, Shariatpur, Madaripur and other districts in the south-west. As a result of the Padma Bridge, about 30 million people in the south-west will be benefited directly. Regarding the role of the Padma Bridge in the country's economy, the World Bank had earlier said that if the Padma bridge is implemented, the GDP growth rate will increase by 1.2 percent. And every year poverty will be reduced to 0.84 percent. The Padma Bridge is being considered as a very important infrastructure for the country's transport network and regional development. The two banks of the Padma Bridge have already become tourist destinations. Almost every day thousands of tourists visit the two banks of the Padma to see the aesthetic beauty. At Mawa and Shariatpur, restaurants, resorts, hotels and motels have been set up.

Work is underway to establish a weaving village at Jajira in the landing point of the Padma Bridge. Many well-known local companies are investing in these areas which will contribute to the socio-economic development of the region. The people concerned in the sector are seeing the possibility of developing the tourism industry in the south and south-west of the country with the launch of the Padma Bridge. They say the Padma Bridge will change the tourism map of the country. As a result, the mangrove forest Sundarbans and Sagarkanya Kuakata can be reached in the fastest time. The launch takes 12 to 14 hours to reach Kuakata via Patuakhali. However, if we go through the Padma bridge, we can reach there in half the time. With the inauguration of the Lebukhali Bridge in Patuakhali in October last year, the journey has become easier.

As a result of the Padma Bridge, there is a huge potential in the tourism industry around Bagerhat including the world heritage Sundarbans and the sixty-domed mosque. If the government and the forest department take an integrated and effective action plan to make use of this potential, its speed will be further accelerated. The precondition for the development of tourism is the development of security and communication system. The Padma Bridge will revolutionize the communication system with the southern part of the country and other regions. The bridge is expected to play an enviable role in the country's economic growth. At present, one of the attractions of travel lovers is the Padma Bridge. This bridge can also change the pace of tourism in the country. Meanwhile, travel agencies are also planning various travel packages around the Padma Bridge. Traders from other parts of the country, including the capital, will be able to transport goods in a short period of time and import and export through Mongla port will be dynamic and export earnings will increase. Kuakata Beach (where sunrise and sunset can be seen), the small islands of adjoining Mangrove Forest of Sundarbans can be made tourist attractions like the Maldives, and there are lots of opportunities to develop wildlife tourism around the Sundarbans. It is possible to attract a large number of international tourists if tourist centers like the neighboring countries India and Maldives are built around the various chars in the southern part. The amount of time it takes to go from Dhaka to Cox's Bazar--- Tourists will reach Kuakata and the Sundarbans in less than half the time if they go through the Padma Bridge.The long-term plan calls for the launch of bullet trains with the Payra Seaport.

If this is implemented, the communication system with other tourist destinations including Kuakata will be further improved which will play a helpful role in attracting domestic and foreign tourists. Every year, 45 cruise ships sail from India via Cooch Behar-Chennai-Goa to neighboring Sri Lanka and Myanmar. However, if these cruises can be attracted to the Payra Seaport, the number of international tourists will increase significantly. The Padma Bridge will make Mongla and Payra ports dynamic which will make a vast contribution to blue economy. Coastal areas of Bangladesh such as Kuakata, Mongla Port and Payra Port are creating new areas for sea tourism.

Timely integrated initiatives in river-based and sea-based tourism will implement the goal of inclusive and sustainable development as well as create employment opportunities, strengthen the national economy. However, in order to attract international tourists, the Padma Bridge and the tourist attractions in the south need to be digitally branded by making small promos. The Padma Bridge is our great achievement. Where the whole world said that Bangladesh will not be able to build the Padma Bridge. Eventually, Bangladesh has built the Padma Bridge with its own funds. It is a great example of the courage and ability of the Bengali nation.

The Padma Bridge has opened now for traffic. There is a lot of potential around this Padma bridge. As to build the Padma bridge, various industries will be set up in the surrounding areas---which was previously unimaginable. And this will open the door to new possibilities in the country's economy. For this, the country and country's economy will be prosperous. Besides, the question of pollution generally comes up as a result of the development of industrial establishments. So we have to be careful of pollution. We have to be vigilant so that the Padma is not polluted due to industrialization. Moreover, since the inauguration of the Padma Bridge, various unwanted and unpleasant incidents have taken place. To avoid these unwanted and unpleasant incidents, the Padma Bridge should be brought under surveillance like the round-the-clock security system. The Padma Bridge is our place of pride. We have had to face many obstacles and challenges in building this bridge. Overcoming all obstacles and challenges, we have finally succeeded to build the bridge. This bridge is mine, yours and ours. And it is the responsibility of all of us to upkeep this bridge and protect its dignity. Emran Emon is a researcher, journalist, and columnist.

Intellectual trafficking: Bar to development

Intellectual or talent trafficking is an international affair that is an integral part of the human migration process. Immigration or relocation of a large number of technically qualified or educated talents results in intellectual trafficking. Talent trafficking usually occurs to avoid war, lack of opportunities, political instability or risk of living. A country loses its most talented, knowledgeable, skilled and deserving citizens due to intellectual trafficking. Nowadays, the tendency of Bangladeshi students to go abroad for higher education is increasing and thousands of meritorious students from government and private universities migrated abroad at one time frustrated as they did not get the desired job. It is learned that they are migrating abroad due to lucrative benefits including scholarships. Most of the student destinations are industrialized countries like USA, Canada, UK, Sweden, Norway, Denmark, Australia, Japan, South Korea etc.

These countries offer scholarships and other lucrative benefits to Bangladeshi students but unfortunately most of the students finish their studies and do not return to the country in time, among them are teachers of many public and private universities. Concerned people complain that they do not return to the country due to high employment, living conditions and quality of life in the countries they have migrated. However, the biggest bar to the country's progress is not properly evaluating the country's meritorious persons. In fact, when people from a country who are highly educated, well trained and able to make quality contributions in their respective fields leave their country and go to another country to work permanently in the interest of that country or use their talent, this is called talent trafficking. Every year a large number of students from our country go abroad for higher education but they do not return to the country.

A huge amount of money is spent in the country for their education. For this reason, intellectual trafficking has become a cause of concern for developing countries. Talent trafficking has increased at an alarming rate in recent years. According to UNESCO's 'Global Flow of Tertiary Level Students', the number of students who migrated abroad for higher education from Bangladesh in 2017 has crossed one lakh. The number of Bangladeshi students in the United States alone is about 10,000 but sadly, about 80 percent of them never return. If talent is smuggled in this way, the country will become incompetent while the government is spending huge amount of money from the state treasury behind these meritorious students. But the developed world is enjoying the benefits of intellectual trafficking. One study found that between 1960 and 1990, the USA and Canada alone adopted one million talented, skilled, technical and professional people from the underdeveloped world. Several years ago, a survey in Bangladesh caused a great stir. The survey found that 82 percent of the country's 15- to 29-year-old population prefers to migrate abroad. This survey shows that a large part of the country assumes that a full assessment of their talents, creativity and qualifications is not possible in this country.

So they choose to leave their homeland and go abroad to ensure the full use of their talents. According to the 2021 "Open Door Report on International Educational Exchange", the United States issued study permits to 8,598 Bangladeshis in the 2020-21 academic year, more than three times as much as in 2009. FACD-CAB says the number of Bangladeshis receiving US scholarships will double in 2022. According to UNESCO, about 24,112 Bangladeshi students migrated abroad in 2015 and this number has quadrupled in 2020. As such, on average 70,000 to 90,000 Bangladeshi students migrate abroad for higher education in every year. When looking for the causes of intellectual trafficking, it is seen that social, economic and political issues are closely associated with intellectual trafficking. Many emigrate in the hope of a healthy and prosperous life - but not all of our students leave the country in this hope. We often taunt them saying that they are selfish and migrate abroad with the country's interests at stake. They are living happily abroad at the expense of the country's money but that is not entirely correct. Many students in our country leave the country disappointed. Many leave the country for a sick system. Many people are forced to live far away from their country when they repeatedly try to get a job but do not get a job despite having talent. Again, there is no difference between the job sectors in our country. We have opened many departments in the universities but we have not been able to diversify our work. So many people go abroad without getting job opportunities. After so many years of independence, without any improvement in science, we are going to face the fourth industrial revolution. Meritorious students from engineering universities are increasingly going abroad. Because the workplace opportunities they need are not available in the country.

Effective measures are needed to stop genuine intellectual trafficking. Authorities of government and non-government organizations of the country should be aware of the proper evaluation of meritorious people in the country now. The meritorious students of this country should be engaged in the welfare of their country through proper evaluation. Allocation to research sector should be increased. Scientists need to increase the necessary facilities, including salaries. In every field of Bangladesh, arrangements have to be made to respect and reward the talents, skills, experience, dedication and creativity. Different incentives can be given if needed. Above all, the country needs to provide all the necessary facilities to utilize the talents of the country so that their full use of talents is ensured and they can play a role in the progress of the country.

Md Zillur Rahaman, Banker and Columnist.